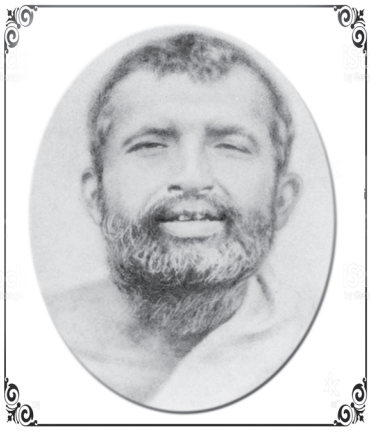

‘ভগবান’ শ্রীরামকৃষ্ণ

সুমন ভট্টাচার্য

‘‘ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥’’
(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৭৪)

—ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টিকে ভগ বলে। এইগুলি সমগ্রভাবে যাঁর মধ্যে বর্তমান, তিনিই ভগবান।

ভগবানের অপার মহিমা বর্ণনা করা কখনই সম্ভব নয়। তবু ভক্ত তাঁর গুণকীর্তন করতে চায়। কারণ ভগবানের নামগুণকীর্তনে, তাঁর স্মরণ-মনন-অনুধ্যানে যে-তৃপ্তি, যে-শান্তি লাভ করা যায় তা আর কিছুতেই নেই।

ভগবান যুগে যুগে ধর্মের গ্লানি দূর করবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, পুনঃস্থাপিত করেন ধর্মকে। বারবার তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। কখনও শ্রীরামচন্দ্ররূপে, কখনও শ্রীকৃষ্ণরূপে, কখনও বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্যরূপে। আবার যুগপ্রয়োজনে তিনি অবতীর্ণ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে।

ভগবান যখন ধরাধামে আসেন তখন তিনি অনন্তগুণশালী হয়েই আসেন, তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায় অনন্ত ভাব। তাই তাঁকে সম্পূর্ণরূপে জানা বা বোঝা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। তবুও সেই অসীম গুণসম্পন্ন সচ্চিদানন্দরূপ অনন্তকে জানার চেষ্টা ভক্তের চিরন্তন। সেই শাশ্বত প্রচেষ্টার পথেই আমাদের এই প্রয়াস—নবযুগ-অবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত এই শ্লোকের পরাকাষ্ঠায় অনুধ্যান।

ঐশ্বর্য

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ‘‘আমার চিন্তা যে করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, পিতার ঐশ্বর্য যেমন পুত্র লাভ করে।’’[১] জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, সমাধি—এই সকল ঐশ্বর্যে মণ্ডিত ভগবানের স্বরূপটি সততই শ্রীময়। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী বলেছেন, ‘‘তাঁর ত্যাগই ছিল ঐশ্বর্য।...’’[২] এ-বিষয়ে বেশ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষের থেকে কিছু অর্থ প্রতিমাসে পেতেন। একবার কোনও গণ্ডগোলে তাঁকে কম বেতন দেওয়া হল। শ্রীশ্রীমা খাজাঞ্চিকে বলতে বলায় ঠাকুর বললেন, ‘‘ছি ছি! হিসাব করব?’’[৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে জানিয়েছেন একটি ঘটনা : ‘‘লক্ষ্মীনারায়ণ মারোয়াড়ী, বেদান্তবাদী, এখানে প্রায় আসত। বিছানা ময়লা দেখে বললে, আমি দশ হাজার টাকা লিখে দোব, তার সুদে

তোমার সেবা চলবে।

''যাই ও-কথা বললে অমনি যেন লাঠি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম!

''চৈতন্য হবার পর তাকে বললাম, তুমি অমন কথা যদি আর মুখে বলো, তা হলে এখানে আর এসো না। আমার টাকা ছোঁবার জো নাই, কাছেও রাখবার জো নাই।

''সে ভারী সূক্ষ্মবুদ্ধি—বললে, 'তাহলে এখনও আপনার ত্যাজ্য, গ্রাহ্য আছে। তবে আপনার জ্ঞান হয় নাই।'

''আমি বললাম, আমার বাপু এতদূর হয় নাই!

''লক্ষ্মীনারায়ণ তখন হৃদের কাছে দিতে চাইলে, আমি বললাম, তাহলে আমায় বলতে হবে 'একে দে, ওকে দে'; না দিলে রাগ হবে! টাকা কাছে থাকাই খারাপ! সে-সব হবে না!

''আরশির কাছে জিনিস থাকলে প্রতিবিম্ব হবে না?''[৪]

শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের অনুপম ত্যাগ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা স্মরণ করেছেন : ''আহা, একদিন খেয়ে নবতের ঘরে গেছেন। বেটুয়ায় মসলা ছিল না। দুটি যোয়ান মৌরি খেতে দিলুম, আর দুটি কাগজে মুড়ে হাতে দিলুম, বললুম, 'নিয়ে যাও।' তিনি নবতের ঘর থেকে ঘরে যাচ্ছেন। কিন্তু ঘরে না গিয়ে সোজা দক্ষিণদিকের নবতের কাছের গঙ্গার ধারের পোস্তায় চলে গেছেন—পথ দেখতে পাননি, হুঁশও নেই। বলছেন, 'মা, ডুবি? মা, ডুবি?' আমি এদিকে ছটফট করছি—ভরতি গঙ্গা। বউ মানুষ, বেরুই না, কোথাও কাউকে দেখিও না। কাকে পাঠাই? শেষে মা কালীর একটি বামুন এদিকে এল। তাকে দিয়ে হৃদয়কে ডাকালুম। হৃদয় খেতে বসেছিল, তাড়াতাড়ি এঁটো হাতেই দৌড়ে একেবারে ধরে তুলে নিয়ে এল। আর একটু হলেই গঙ্গায় পড়ে যেতেন।

''হাতে দুটি যোয়ান দিয়েছিলুম কিনা। সাধুর সঞ্চয় করতে নেই, তাই পথ দেখতে পাননি। তাঁর যে ষোল আনা ত্যাগ।''[৫]

এই 'ষোল আনা ত্যাগ'-ই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশ্বর্য।

পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের যেমন যুদ্ধপারঙ্গমতা, পরাক্রম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যেমন প্রখর ধীশক্তি ও দৈত্যবিনাশকারী বীর্য, শ্রীরামকৃষ্ণের তেমনি ত্যাগ। এ তাঁর অধীত সাধনলব্ধ আড়ম্বর নয়, সৃষ্টির আদি থেকে অন্তর্গত প্রণবধ্বনির মতো এ তাঁর শাশ্বত সত্য ঐশ্বর্য।

বীর্য

বীর্য অর্থাৎ বীরত্ব, শৌর্য, তেজ, পরাক্রম, শক্তি।

ভাগবতে পাই, মনু অবতারে ভগবান নিজ অচিন্তনীয় শক্তি ও তেজের পরিচায়ক সুদর্শন চক্র ধারণ করেন। চক্র ও তেজের দ্বারা চতুর্দিকে তিনি নিজ মহিমা বিস্তার করেন এবং তাঁর দ্বারা শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন কার্য সাধিত হয়। আবার পরশুরামরূপে তিনি ক্ষত্রিয়কুলকে তীক্ষ্ণধার কুঠারের দ্বারা একবিংশতিবার বিনাশ করেছিলেন।

তারপর জীবের প্রতি করুণাশীল ভগবান রামচন্দ্ররূপে এসে রাক্ষসরাজ রাবণ সহ রাক্ষসকুলকে ধ্বংস করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শৌর্যও অসাধারণ। তিনি অতি শিশুকালে বিকটাকার রাক্ষসী পূতনার প্রাণসংহার করলেন, তিনমাস বয়সে শকটাসুর বধ করলেন। যমুনাহ্রদকে বিষমুক্ত করার জন্য অতিবিষাক্ত কালীয় নাগকেও বিতাড়ন করলেন। গিরি গোবর্ধন ধারণ, শৈশবে বহু অসুর বধ, কৈশোরে কংসবধ ছাড়াও সারা জীবন ধরে প্রধান অসুরদের এবং মহাবীর রাজাদের তিনি বিনাশ করেছেন।

শ্রীচৈতন্য অবতারে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার মিলিত তনুধারণ করে ভগবান ধরায় অবতীর্ণ হলেন আপামর জনসাধারণের তৃষিত হৃদয়ে প্রেমবারি

সিঞ্চন করতে। কিন্তু অমন প্রেমের অবতারের মধ্যেও বারবার ভগবানের বীর্যবত্তা ফুটে উঠেছে। নবদ্বীপে চাঁদকাজি কীর্তনে নিষেধাজ্ঞা জারি করলে শ্রীগৌরাঙ্গ সেই অবস্থার মোকাবিলা করেছিলেন সাহসের সঙ্গে। কখনও তিনি অভক্তসম্প্রদায়ের দৌরাত্ম্যের কথা শুনে—

'' 'সংহারিমু সব' বলি করয়ে হুঙ্কার।
'মুঞি সেই, মুঞি সেই', বলে বার বার॥''[৬]

ইদানীং রাম ও কৃষ্ণ একাধারে আগমন করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। তিনিও দুষ্টের 'দমন' করেছেন, তবে অভিনব উপায়ে।

একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ দেখতেন অন্যান্য ভক্তেরা কেমন সেবা করছেন শ্রীরামকৃষ্ণের। তাঁর মনে হল যদি ঠাকুর তাঁর সন্তান হয়ে আসেন তাহলে সাধ মিটিয়ে সন্তানজ্ঞানে গুরুসেবা করা যাবে। একদিন ঠাকুর থিয়েটার দেখতে এলে মদমত্ত গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে বসলেন : ''তুমি আমার ছেলে হবে—বল।'' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন যে তাঁর পিতা শুদ্ধসত্ত্ব ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি কেন গিরিশের ছেলে হতে যাবেন। শুনে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন গিরিশ। শ্রীরামকৃষ্ণকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগলেন। এতে উপস্থিত ভক্তেরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ঠাকুরকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন আর অমন পাষণ্ডের কাছে না যান। পরদিন দক্ষিণেশ্বরেও ওই প্রসঙ্গ। শ্রীরামকৃষ্ণ সব কথা চুপ করে শুনছিলেন। এমন সময়ে সেখানে উপস্থিত হলেন ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—''রাম, তুমি কি বল?'' রামবাবু উত্তর দিলেন, ''দেখুন, কালীয় সাপ যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিল, 'প্রভু আমায় বিষ দিয়েছেন, আমি অমৃত পাব কোথায়?'—গিরিশবাবুরও সেই দশা, তিনি অমৃত পাবেন কোথায়?'' একথা শুনেই ঠাকুর বললেন, ''তবে চল, রাম, তোমার গাড়িতেই একবার সেখানে যাই।''

ওদিকে নেশা কেটে যেতেই গিরিশ নিজের অপরাধ স্মরণ করে আহার ত্যাগ করে বসে আছেন। এমন সময় ঠাকুরকে নিজের বাড়িতে দেখে তাঁর চরণে পড়ে গিরিশ বলতে লাগলেন : ''আজ যদি তুমি না আসতে, ঠাকুর, তাহলে বুঝতুম, তুমি এখনো নিন্দাস্তুতিকে সমান জ্ঞান করতে পারনি—তোমার পরমহংস নামে অধিকার আসেনি। আজ বুঝেছি তুমি সেই, তুমি সেই। আর আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না। এবার আমি আর তোমায় ছাড়ছি না। বল, তুমি আমার ভার নেবে, আমায় উদ্ধার করবে?''[৭]

শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে নবজীবন পেয়েছিলেন গিরিশ। তিনি শেষ জীবনে বলতেন, পাপ রাখার এতবড় আধার আছে জানলে তিনি আরও পাপ করে নিতেন।[৮] বিশ্বাসের গভীরতায় তিনি বলতেন, তিনি গঙ্গাস্নান করলে মা গঙ্গা আরও পবিত্র হবেন। গিরিশ বুঝেছিলেন : ''তাঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) মানা, ভালবাসা, পূজা করা কঠিন নয়, তাঁকে ভুলাই কঠিন।''[৯] এক রাত্রে গিরিশ বন্ধুসঙ্গে মদ্যপান করছিলেন, হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখার প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় সোজা চলে এলেন তাঁর কাছে। তখন রাত এগারোটারও বেশি। তাঁদের কারণানন্দ দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের জগৎকারণের উদ্দীপন হল। তিনি গান গাইতে গাইতে আনন্দে উন্মত্ত হয়ে গেলেন, আর তাঁদের সঙ্গে নাচতে শুরু করলেন। গিরিশ অনুভব করলেন—এই গভীর রাত্রে যখন এইরকম দুশ্চরিত্রদেরকে কেউ স্থান দেবে না, দরজা বন্ধ করে রাখবে, তখন একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণেরই দ্বার এদের জন্য অবারিত।[১০]

তাই জীবনসায়াহ্নে গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তুতি করে লিখেছেন—

''সকল মঙ্গলালয়, পূর্ণ বিরাজিত,
প্রেমের আধার!

নির্বিকার, হর্ষ-শোক-বাসনা-বর্জিত,
জ্ঞানদীপ্ত মূর্তি মহিমার!...
ত্যাজি কন্যা-পুত্র-নারী, পানাসক্ত অত্যাচারী,
লোকত্যাজ্য ঘৃণিত জীবন—
তব দ্বার মুক্ত তার পতিতপাবন!"[১১]

মারীচকে বধ করে তাকে মুক্ত করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র, কালীয় নাগকে দণ্ড দিয়ে সাগরে পাঠিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। আর শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ যথাক্রমে জগাই-মাধাই ও গিরিশচন্দ্রের অন্তরের আসুরিক শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে তাঁদেরকে পরিণত করেছেন ঈশ্বর-অনুরাগী, ভক্তপ্রবর মহাত্মায়। নবরূপে প্রকাশ পেয়েছে ভগবানের অসীম শৌর্য।

যশ

কেশবচন্দ্র সেন চেয়েছিলেন পত্র-পত্রিকায় সংবাদপত্রে লিখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা প্রচার করবেন। ঠাকুর বলেন, অমন করলে তাঁর শরীর থাকবে না। অন্য একদিন কেশব বলেন, ''আপনি কতদিন এরূপ গোপনে থাকবেন—ক্রমে এখানে লোকে লোকারণ্য হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দেন, ''ও তোমার কি কথা। আমি খাই দাই থাকি, তাঁর নাম করি। লোক জড় করাকরি আমি জানি না।...আমি সকলের রেণুর রেণু। যিনি দয়া করে আসবেন, আসবেন।"[১২]

ভগবান নাম-যশের বশবর্তী নন। তবে তিনি যখন অবতাররূপে আসেন তাঁকে অবলম্বন করে অসংখ্য লোক সংসারসমুদ্রের পারে চলে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় : অবতার ''বাহাদুরী কাঠ, আপনিও ভেসে যায়, আবার অনেক জীবজন্তুকেও নিয়ে যেতে পারে। স্টীমবোট—আপনিও পার হয়ে যায় এবং অপরকে পার করে নিয়ে যায়।"[১৩]

তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম আশ্রয় করে আজ শতসহস্র নরনারী দুঃখ-যন্ত্রণার পারে অসীম শান্তিসাগরে নিমগ্ন হচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে লোকমান্যতা-কে তুচ্ছ মনে করতেন সে-সম্পর্কে আমরা আরও জানতে পারি স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতি থেকে—''একদিন আমি রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শয়নকক্ষে শুইয়াছিলাম। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আমি জাগিয়া দেখি যে শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানা হইতে উঠিয়া ঘরের ভিতর পায়চারি করিতেছেন এবং কেবল বলিতেছেন, 'লোকমান্যি দিস নে, মা, হ্যাক থু, থু।' কেবল বারবার এই কথাই বলিতেছেন এবং থুথু ফেলিতেছেন। সমস্ত রাত্রি এইভাবে কাটিয়া গেল। আমি ভাবিলাম, লোকমান্য পাবার জন্য সংসারের লোক এত পাগল। কিন্তু তার উপর ঠাকুরের কি ঘৃণা! আমার মনে হতে লাগল যেন শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরকে লোকমান্য দেবার জন্য উন্মুখ ছিলেন। কিন্তু ঠাকুর তা বারবার প্রত্যাখ্যান করলেন।..."[১৪]

যাঁরা নবীন, তেজস্বী, উৎসাহে পূর্ণ, সর্বোপরি সংসার যাঁদের মনে শিকড় গেড়ে বসেনি, তাঁদের সম্ভাবনাকে উদ্দীপিত করে শ্রীরামকৃষ্ণ নামযশের বাসনা অগ্রাহ্য করে সাধন-ভজনে ডুবে যেতে উপদেশ দিতেন।

ভগবান সর্বদা যশোময়। কিন্তু যশের আকাঙ্ক্ষায় ভক্ত পাছে পথভ্রষ্ট হয়, সে-বিষয়ে তিনি সদা সতর্ক করে দিয়েছেন, স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে নামযশ নয়, একমাত্র ভগবানলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।

ভগবানের মহিমা কীভাবে স্বতই বিস্তৃত হয় সে-বিষয়ে দুটি ঘটনা স্মরণ করতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদার স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় : ''অযোধ্যায় একজন যুবক রামাৎ সাধু বুঝতে পারলেন যে ভগবান আবার ধরাধামে (পূর্বাঞ্চলে) অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি তাঁকে দেখবার জন্য অযোধ্যা হতে পদব্রজে রওনা হলেন। আসতে আসতে বাংলাদেশে এসে

শুনলেন যে কলকাতার নিকটে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে একজন বড় সাধু আছেন। সন্ধান করে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন। এসেই জিজ্ঞেস কচ্ছেন, তিনি (রামকৃষ্ণ পরমহংস) কোথায়? কালীবাড়ির লোক তাঁকে বললে যে, এই কয়েকদিন হলো তিনি শরীর ত্যাগ করেছেন। এই কথা শুনে সাধুটি 'হাম এত্না তকলিব করকে অযোধ্যাসে উন্‌কো ওয়াস্তে পয়দল আতে হে আউর ও শরীর ছোড় দিয়া?' এই বলে খুব কাঁদতে লাগলেন। ওঁকে কালীবাড়ির সদাব্রত হতে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলে, কিন্তু তিনি কিছু না খেয়ে ২/৩ দিন পঞ্চবটীতে পড়ে রইলেন। এ সময় একদিন রাত্রে তিনি দেখেন—নহবতের পাশে বকুলতলার ঘাট দিয়ে ঠাকুর গঙ্গা থেকে উলঙ্গ অবস্থায় উঠলেন; উঠে ওঁকে বললেন, 'তুই এ কদিন খাসনি, এই পায়েস এনেছি, খা।' এই বলে ওঁকে খাওয়ালেন এবং তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরদিন সকালে আমি (রামলালদাদা) পঞ্চবটী গিয়ে দেখি সাধুটির খুব আনন্দ। জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি এতদিন বিমর্ষ ছিলে, হঠাৎ তোমার এত আনন্দ দেখছি কেন?' সাধুটি তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন এবং ঠাকুর যে মাটির সরাতে করে ওঁকে পায়েস খাইয়েছিলেন সে সরাটিও দেখালেন।"[১৫]

সুদূর চেকোশ্লোভাকিয়ার শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাক স্বপ্নে এক দাড়িওলা মুখ দর্শন করেন। দর্শনমাত্র তিনি বুঝলেন যে ইনি একজন ভারতীয় মহাত্মা। কিন্তু ইনি কে হতে পারেন—সে-সম্বন্ধে তিনি কোনও ধারণাই করতে পারলেন না। অবশেষে তাঁর হাতে এসে পড়ল ম্যাক্সমুলারের লিখিত—'Life and Sayings of Sri Ramakrishna' বইটি। তাতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি দেখতে পেলেন, চমকিত হয়ে অনুধাবন করলেন তাঁর স্বপ্নে দৃষ্ট ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নন।

পুষ্প প্রস্ফুটিত হলে যেমন তার আঘ্রাণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ভগবান ধরায় অবতীর্ণ হলে ঠিক তেমনিভাবে ভক্তহৃদয়ে তাঁর শ্রীমন্দির নির্মিত হয়ে যায় আপনা-আপনি। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর যশ।

শ্রী

তুলসীদাস বর্ণনা করেছেন, শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্যের ছটা অগণিত কামদেবের চেয়েও বেশি। তাঁর শরীর নবীন নীল-সজল মেঘের মতো সুন্দর।

আর শ্রীকৃষ্ণের রূপ, সে এমনই অতুলনীয় যে তা ভাষায় বর্ণনীয় নয়, তাঁর সকলই মনোহরণকারী। ''মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।"

আর শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ কেমন ছিল? শ্রীশ্রীমা স্বয়ং তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন—''তাঁর গায়ের রং যেন হরিতালের মতো ছিল—সোনার ইষ্ট-কবচের সঙ্গে গায়ের রং মিশে যেত। যখন তেল মাখিয়ে দিতুম, দেখতুম সব গা থেকে যেন জ্যোতিঃ বেরুচ্ছে।...

''যখনই কালীবাড়ীতে বার হতেন, সব লোক দাঁড়িয়ে দেখত, বলত 'ঐ তিনি যাচ্ছেন।'...

''কামারপুকুরে যখন যেতেন, ঘরের বার হলেই মেয়েমদ্দ হাঁ করে চেয়ে থাকত। একদিন ভূতির খালের দিকে বেরিয়েছেন, চারদিকে মেয়েগুলো—যারা জল আনতে গেছে—হাঁ করে দেখছে আর বলছে, 'ঐ ঠাকুর যাচ্ছেন।' ঠাকুর হৃদয়কে বলছেন, 'ও হৃদু আমায় ঘোমটা দিয়ে দে।' "[১৬]

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেছেন (২।১।৩৮),

''ইয়ানসাবীশ্বরবিগ্রহস্য
যঃ সন্নিবেশঃ কথিতো ময়া তে।
সন্ধার্যতেঽস্মিন্ বপুষি স্থবিষ্ঠে
মনঃ স্ববুদ্ধ্যা ন যতোঽস্তি কিঞ্চিৎ॥"

—তোমার নিকট আমি বিরাটপুরুষের এই যে অবয়ব সংস্থান বিষয়ে বর্ণনা করলাম, এখন সেই স্থূলতম, সর্বব্যাপী বিগ্রহে চিত্ত সমাহিত কর। কারণ তিনি ছাড়া জগতে আর কিছুই নেই—তিনি সর্বময়।

শ্রীরামকৃষ্ণও বহুভাবে বহুবার ব্যক্ত করেছেন যে তাঁর রূপে মন স্থির করতে পারলে আর কিছুই করতে হবে না। তাঁর প্রতি এক বালক ভক্তের আকর্ষণ দেখে তিনি বলেছিলেন, ''সব মনটা কুড়িয়ে যদি আমাতে এল, তাহলে তো সবই হল।''

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি, বিশেষত তাঁর মধুর হাস্যবিমণ্ডিত মুখের ছবি জগতের সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটাতে পারে। কিন্তু যতই শ্রী-যুক্ত হোক না কেন তাঁর অঙ্গ, তাঁর মন দেহেতে থাকত না, নিমগ্ন থাকত ঈশ্বরীয় আনন্দজগতে। কথামৃতকার শ্রীম তাই বলেছেন, ''...যেই একটি কথা হলো, কি গান হলো যে কোন ঈশ্বরীয় বিষয় হউক না, অমনি দপ্ করে যেন জ্বলে উঠত ঈশ্বরীয় ভাব। তখন মন দেহেতে নেই, ঈশ্বরে নিমগ্ন। 'মা মা' বলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়তেন। ঈশ্বর যখন মানুষ শরীর নিয়ে আসেন কেবল তখনই এই অবস্থা সম্ভব। অপরের পক্ষে অসম্ভব।''

জ্ঞান

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এক চিঠিতে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, ''রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম, অনন্ত জীবে দয়া।''

সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তিস্থল তিনি, আবার জ্ঞানের লয়ও তাঁতেই, তাই ভগবান সততই জ্ঞানময়।

শ্রীমদ্ভবদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানের প্রতীক। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ''শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস?—সমস্ত গীতাটা personified (মূর্তিমান)! যখন অর্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি তাঁকে গীতা বলেছেন, তখন তাঁর central idea (মুখ্যভাব)-টি তাঁর শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।''[১৭] মানবের মোহ, কাপুরুষতা, অহংকার চূর্ণ করে সত্য জ্ঞানের জাগরণ ঘটাতে ভগবান অবতাররূপে তাঁর জ্ঞানের সম্যক প্রকাশ ঘটান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বইপড়া জ্ঞানে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি খুব বই পড়েন কি না জিজ্ঞাসিত হয়ে বৃন্দে ঝি মাস্টারমশাইকে বলেছিল, ''আর বাবা বই-টই! সব ওঁর মুখে।''

স্বামী প্রেমানন্দ এই অসীম জ্ঞানভাণ্ডার দিব্যপুরুষের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, ''ঠাকুরের জীবন হচ্ছে জীবন্ত জ্বলন্ত উপনিষদ্। মহাপ্রভু না জন্মালে যেমন রাধাকৃষ্ণের পবিত্র প্রেম কেউ ধরতে বুঝতে পারত না, তেমনই ঠাকুর হচ্ছেন উপনিষদের জীবন্ত মূর্তি। উপনিষদ্ তো লোকে বহুকাল হতে পড়ে থাকে ও মুখস্থ করে, বহুকাল থেকে চলেও আসছে—তবে কেন লোকে আমাদের মূর্খ নিরক্ষর ঠাকুরকে মানে, তাঁর কথা বেদবাক্য বলে মানে। তিনি নিজে তো উপনিষদ্‌ও পড়েননি, কিছুই না। তবে কি করে সেই জটিল ব্যাখ্যা সকল তিনি সোজা সিধে কথায় সকলকে বোঝাতেন? কোন্ কালে, কোন্ জন্মে বেদ হয়েছে, সেই পড়বার জন্য ব্যাকরণ মুখস্থ কর, কত লোক তার আবার টীকা ভাষ্য নিজের মতের মতন কচ্ছে; ...আর ঠাকুর উপনিষদ্ না পড়ে, সেই সব কেমন সোজা কথায় বুঝাচ্ছেন;... সামনে এমন সুন্দর ফোয়ারা থাকতে কুয়ো খুঁড়ে তবে জল খেতে হবে?''[১৮]

স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, ''ঠাকুরকে ঐ সব বেদ-বেদান্ত, যোগ-বিজ্ঞানের কথা কহিতে শুনিয়া আমাদের কেহ কেহ আবার কখনো কখনো তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, 'মশাই, আপনি তো লেখাপড়ার কখনো ধার ধারেননি, এত সব জানলেন কোথা থেকে?' অদ্ভুত ঠাকুরের ঐ অদ্ভুত প্রশ্নেও বিরক্তি নাই! একটু হাসিয়া বলিতেন, 'নিজে পড়ি নাই, কিন্তু ঢের সব যে শুনেছি গো! সেসব মনে আছে! অপরের কাছ থেকে, ভাল ভাল পণ্ডিতের কাছ থেকে, বেদ-বেদান্ত দর্শন-পুরাণ সব শুনেছি।...''[১৯]

বৈরাগ্য

আচার্য শংকর তাঁর 'নির্বাণষট্‌কম্' স্তোত্রমালায় বলছেন—

''ন পুণ্যং ন পাপং ন সুখং ন দুঃখং
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥''

শাস্ত্রোল্লিখিত বৈরাগ্যময় সত্তার পূর্ণপ্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে দেখা যায়। সেই কালের হিসেবে এক বিরাট অঙ্কের টাকা লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারি তাঁকে দিতে চাইলে তাঁর কী অবস্থা হয়েছিল আমরা জানি। টাকার স্পর্শে তিনি শিঙি মাছের বিষকাঁটা ফোটানোর মতো যন্ত্রণা অনুভব করতেন। তাঁর নামে টাকা দেওয়া হয়েছে, তাতেই তাঁর শুরু হয়েছিল বক্ষোযন্ত্রণা। তাঁর শ্রীমুখের কথায় : ''এখানে সিঁথির মহিন্দোর পাল পাঁচটি টাকা দিয়ে গিছল—রামলালের কাছে। সে চলে গেলে পর রামলাল আমায় বললে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন দিয়েছে? রামলাল বললে, এখানের জন্যে দিয়েছে। তখন মনে উঠতে লাগল যে—দুধের দেনা রয়েছে, না হয় কতক শোধ দেওয়া যাবে। ওমা, রাত্রে শুয়ে আছি, হঠাৎ উঠে পড়লাম। একবার বুকের ভিতর বিল্লি আঁচড়াতে লাগল! তখন রামলালকে গিয়ে বললাম, কাকে দিয়েছে? তোর খুড়ীকে কি দিয়েছে? রামলাল বললে, না আপনার জন্য দিয়েছে। তখন বললাম, না; এক্ষুণি টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আয়, তা না হলে আমার শান্তি হবে না।

''রামলাল ভোরে উঠে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আসে, তবে হয়।''[২০]

শশধর তর্কচূড়ামণি কাশীপুরের বাগানে গলরোগে আক্রান্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এসেছেন। তাঁকে তিনি বললেন, ''আপনি যদি শরীরের দিকে একটু মন দেন তাহলে আপনার গলার অসুখ নিশ্চয়ই সেরে যাবে।'' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে বললেন, ''যে মন একবার ভগবানকে দিয়েছি, তা এই রক্ত-মাংসের শরীরের দিকে আবার কেমন করে দিতে পারি বলুন।'' তর্কচূড়ামণি বললেন, ''তবে মার (জগন্মাতার) সঙ্গে যখন কথা কইবেন তখন তাঁকে আপনার গলার ঘায়ের যাতে উপশম হয় সে কথা বলবেন।'' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ''আমি যখন জগতের মাকে দর্শন করি তখন আমার শরীর ও জগৎ সবই ভুল হয়ে যায়। সুতরাং তুচ্ছ হাড়-মাংসের শরীরের কথা আর মাকে কেমন করে বলি।''[২১]

একদিন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে একজন বিষয়ী মানুষ এসে নানান বিষয়কথা বলতে থাকলে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ''এখানে এসব কথা নয়, (খাজাঞ্চিখানা দেখিয়ে) ঐখানে যাও।'' সে চলে গেলে ঠাকুর লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ)-কে বললেন, ''ওরে! ঐ কোণে গঙ্গাজল আছে, ছিটিয়ে দেনা রে। শালা কাম-কাঞ্চনের দাস! ঐ জায়গায় বসে সাত হাত মাটি নোংরা করে দিয়ে গেলো। বেশ ভালো করে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দে!''[২২]

কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের মূর্ত প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণজীবন। একবার ডাক্তার ভগবান রুদ্র এসেছেন, ঠাকুর তাঁকে বললেন তাঁর হাতের উপর চাকা রেখে দেখতে। টাকা রাখা মাত্র তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে হাত আড়ষ্ট হয়ে গেল।

সম্পূর্ণ বন্ধনহীনতাই বৈরাগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তিনি কোনও বন্ধন—তা সে যত সামান্যই হোক না কেন—সহ্য করতে পারতেন না। স্বামী প্রেমানন্দের কথা থেকে জানা যায় যে তিনি মশারি গুঁজে দিতে বা জামার বোতাম লাগাতে পারতেন না, দরজায় খিল দিতেন না।[২৩]

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শ্রীরামকৃষ্ণের জ্বলন্ত বৈরাগ্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, ''তাঁর তুলনাহীন নৈতিক চরিত্রের গোপন চাবিকাঠি হলো

কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ। তিনি দীর্ঘকাল একটি অসাধারণ সাধনায় নিরত ছিলেন। তিনি এক হাতে একটি কাঞ্চনমুদ্রা এবং অপর হাতে এক খণ্ড মাটি নিতেন। তারপর দুই হাতের দিকে তাকিয়ে বারবার 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলতে বলতে এ-হাতের জিনিস ও-হাতে এবং ও-হাতের জিনিস এ-হাতে করতেন। এইরকম কিছুক্ষণ করতে করতে তাঁর টাকা ও মাটির ভেদজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হতো।... তাঁর কর্মের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ সংসারবিমুখতা ও লাভাকাঙ্ক্ষাহীনতা।"[২৪]

জীবের প্রতি অতুলনীয় করুণাপরবশ, নিজ সুখভোগের প্রতি সম্পূর্ণ বৈরাগ্যদশা প্রাপ্ত তিনি, তাই বলতে পারেন : ''যদি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করে একজনের উদ্ধার সাধন করতে পারি, তাহাও সার্থক বোধ করি।"[২৫] পেটে ক্ষুধা, খাওয়ার উপায় নেই, উঠে বসে সুখ নেই, অষ্টপ্রহর গাত্রদাহ, কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ অবধি নেই। নিজের শরীরের প্রতি এমনই ছিল তাঁর বৈরাগ্য।

অবতারের মধ্যে অসংখ্য ভাবের সমাবেশ দেখা যায়। কর্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি, ত্যাগ, বৈরাগ্য—প্রতিটিই পরস্পর গভীর অন্বয়ে বিকশিত এবং কোনওভাবেই একটি অপরটির বিরোধী নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এই সকল ভাবগুলিই অত্যন্ত পরিস্ফুট। তাই তাঁর সম্পর্কে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'তে অক্ষয়কুমার সেন মহাশয় লিখেছেন—

''চৌদ্দপুয়া নরাধারে অখিলের পতি।
থলির ভিতর যেন ঐরাবত হাতী॥...
নরাধারে ঈশ্বর্যাদি সমভাবে রাজে।
বৃক্ষের সম্পত্তি যেন অতি ক্ষুদ্র বীজে॥" ✠

তথ্যসূত্র

১। স্বামী চেতনানন্দ, *ধ্যানলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৬), পৃঃ ১৫
২। সংকলক ও সম্পাদক : স্বামী চেতনানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৯), পৃঃ ৭
৩। তদেব
৪। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), অখণ্ড, পৃঃ ৬১০
৫। *শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি*, পৃঃ ৮
৬। *চৈতন্যভাগবত* (মধ্য ২।৮৬)
৭। দ্রঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৮), অখণ্ড, পৃঃ ৫২৩-২৪
৮। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৫২৫
৯। স্বামী চেতনানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৯), পৃঃ ১১৮
১০। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৩০১-০২
১১। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, *শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও বিবেকানন্দ*, সম্পাদনা ড. প্রদ্যোত সেনগুপ্ত (জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং : কলকাতা, ২০১৩), পৃঃ ১৫১-৫২
১২। *কথামৃত*, পৃঃ ১০৯৯
১৩। তদেব, পৃঃ ৪৮২
১৪। *শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি*, পৃঃ ৭৯
১৫। তদেব, পৃঃ ৩৯
১৬। তদেব, পৃঃ ৬-৭
১৭। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), খণ্ড ৯, পৃঃ ২৬৭
১৮। *শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি*, পৃঃ ৮৩-৮৪
১৯। স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০), ভাগ ১, গুরুভাব—পূর্বার্ধ, পৃঃ ৩৭
২০। *কথামৃত*, পৃঃ ২৬৩
২১। *শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি*, পৃঃ ১৯৯-২০০
২২। তদেব, পৃঃ ৬৯
২৩। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৭৯
২৪। তদেব, পৃঃ ৩৫২
২৫। স্বামী প্রভানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা*, খণ্ড ২ (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৭), পৃঃ ১০৫